জিহাদের হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

জিহাদের উদ্দেশ্য

নমায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার আমি বলেছি যে, এসব ইবাদত অন্যান্য ধর্মের ইবাদতের ন্যায় নিছক পূজা, উপাসনা এবং যাত্রার অনুষ্ঠান মাত্র নয়; কাজেই এ কয়টি কাজ করে ক্ষান্ত হলেই আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি খুশি হতে পারেন না। মূলতঃ একটি বিরাট উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করার জন্য এবং একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে সুদক্ষ করার উদ্দেশ্যেই এসব ইবাদত মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে৷ এটা মুসলমানকে কিভাবে সেই বিরাট উদ্দেশ্যর জন্য প্রস্তুত করে এবং এর ভিতর দিয়ে মুসলমান কেমন করে সেই বিরট কাজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করে, ইতিপূর্বে তা আমি বিস্তারিত রূপে বলেছি। এখন সেই বিরাট উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ এবং তার বিস্তারিত পরিচয় দানের চেষ্টা করবো।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানুষের উপর থেকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির) প্রভুত্ব বিদূরিত করে শুধু আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করাই এসব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করার নামই হচ্ছে জিহাদ। নামায, রোযা ও যাকাত প্রভৃতি ইবাদাতের কাজগুলো মুসলমানকে এ কাজের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত করে৷ কিন্তু মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে এ মহান উদ্দেশ্য ও বিরাট কাজকে ভুলে আছে৷ তাদের সমস্ত ইবাদাত বন্দেগী নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, জিহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর অন্তর্নিহিত বিরাট লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সে জন্য বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

দুনিয়ায় যত পাপ, অশান্তি আর দুঃখ-দুর্দশা স্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার মূল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থার মূলগত দোষ-ত্রুটি, শক্তি এবং সম্পদ সবই সরকারের করায়ত্ব থাকে। সরকারই আইন রচনা করে এবং জারী করে। দেশের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা, শাসন ইত্যাদির যাবতীয় ক্ষমতা সরকারেরই একচ্ছত্র অধিকারের বস্তু। পুলিশ ও সৈন্য-সামন্তের শক্তি সরকারের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। অতএব, এতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যা কিছু অশান্তি এবং পাপ দুনিয়ায় আছে তা হয় সরকার নিজেই সৃষ্টি করে, নতুবা সরকারের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য ও সমর্থনে তা অবাধে অনুষ্ঠিত হতে পারছে। কারণ দেশের কোন জিনিসের প্রচার ও স্থায়িত্ব লাভের জন্য যে শক্তির আবশ্যক তা সরকার ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, দুনিয়ার চার দিকে ব্যভিচার অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে---- দালান কোঠায়, বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে এ পাপকার্য সম্পন্ন হচ্ছে৷ কিন্তু এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ এই যে, রাষ্ট্র ও সরকার কতৃর্পক্ষের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বিশেষ কোন অপরাধ নয়৷ বরং তারা নিজেরাই এ কাজে লিপ্ত হয়ে আছে এবং অন্যকেও সে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নুতবা সরকার যদি এ পাপানুষ্ঠান বন্ধ করতে চায়, তবে এটা এত নির্ভিক ভাবে চলতে পারে না। অন্যদিক সুদের কারবার অব্যাহতভাবে চলছে। ধনী লোকগণ গরীবদের বুকের তাজা-তপ্ত রক্ত শুষে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এটা কেমন করে হতে পারছে? শুধু এই যে সরকার নিজেই সুদ খায় এবং সুদখোরদের সাহায্য ও সমর্থন করে৷ সরকারের আদালতসমূহ সুদের ডিক্রী দেয় এবং তাদের সহায়তা পায় বলে চারদিকে বড় বড় ব্যাংক আর সুদখোর মহাজন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে৷ বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে ও সমাজে লজ্জাহীনতা ও চরিত্রহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরও একমাত্র কারণ এই যে, সরকার নিজেই লোকদেরকে এরূপ শিক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের চরিত্রকে এরূপেই গঠন করছে৷ চারিদিকে মানব চরিত্রের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে, সরকার তাই ভালবাসে ও পছন্দ করে। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কোন শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করতে চায় তাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হতে পারে না৷ কারণ, সে জন্য যে উপায়-উপাদান একান্ত অপরিহার্য তা সংগ্রহ করা বেসরকারী লোকদের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভব হয় না৷ আর বিশেষ প্রচেষ্টার পর তেমন কিছু লোক তৈরী করতে পারলেও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের নিজ নিজ আদর্শের উপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে৷ যেহেতু জীবিকা উপার্জেনের যত উপায় আছে এবং এই ভিন্নতর চরিত্র-বিশিষ্ট্য লোকদের বেঁচে থাকার যত গুলো পন্থা থাকতে পারে, তার সবগুলোই বন্ধ দরজার চাবিকাঠি সাম্প্রতিক বিকৃত ও গোমরাহ্ সরকারের হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে৷ দুনিয়ায় সীমা-সংখ্যাহীন খুন-যখম ও রক্তপাত হচ্ছে৷ মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞান আজ গোটা মানুষকে ধ্বংস করার উপায় উদ্ভাবনেই নিযুক্ত হয়ে আছে৷ মানুষের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আজ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করা হচ্ছে৷ মানুষের অসংখ্য মূল্যবান জীবনকে মূল্যহীন মাটির পাত্রের ন্যায় অমানুষিকভাবে সংহার করা হচ্ছে৷ কিন্তু এটা কেন হয়? হওয়ার কারণ শুধু এটাই যে, মানব সন্তানের মধ্যে যারাই সর্বপেক্ষা বেশী শয়তান প্রকৃতির ও চরিত্রহীন, তারাই আজ দুনিয়ার জাতিসমূহের 'নেতা' হয়ে

বসেছে এবং কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের সার্বভৌম শক্তি নিজেদরাই কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আজ শক্তি সামগ্রিকভাবে তাদের করতলগত, তাই তারা আজ দুনিয়াকে যে দিকে চালাচ্ছে দুনিয়া সে দিকেই চলতে বাধ্য হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, শ্রম মেহনত এবং জীবন ও প্রাণের ব্যবহার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা যা কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাতেই আজ সব উৎসর্গীকৃত হচ্ছে। দুনিয়ায় আজ যুলুম ও অবিচারের প্রবল রাজত্ব চলছে। দুর্বলের জীবন বড়ই দুঃসহ হয়ে পড়েছে। এখানকার আদালত বিচারালয় নয় এটা আজ বানিয়ার দোকান বিশেষে পরিণত হয়েছে। এখানে আজ কেবল টাকা দিয়ে 'বিচার' ক্রয় করা যায়। মানুষের মাঝ থেকে আজ জোর-যবরদস্তি করে ট্যাক্স আদায় করা হয়। সেই ট্যাক্সের পরিমাণেও কোন সীমাসংখ্যা নেই এবং সরকার তা উচ্চ কর্মচারীদেরকে রাজকীয় বেতন ও ভাতা দেয়ায় (উজির-দূতের টি-পার্টি আর ককটেল পার্টি দেয়ায়), বড় বড় দালান-কোঠা তৈরী করায়, লড়াই সংগ্রামের জন্য গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করায় এবং এ ধরনের অসংখ্য অর্থহীন কাজে গরীবদের রক্ত পানি করে উপর্জিত অর্থ-সম্পদ নির্বিচারে খরচ করছে। সুদখোর-মহাজন, জমিদার, রাজা এবং সরদার উপাধি প্রাপ্ত এবং উপাধি প্রার্থীর রাজন্যবর্গ, গদিনশীন পীর ও পুরোহিত, সিনেমা কোম্পানীর মালিক, মদ ব্যবসায়ী, অশ্লীল পুস্তক-পত্রিকা প্রকাশক ও বিক্রেতা এবং জুয়াড়ী প্রভৃতি অসংখ্য লোক আজ আল্লাহর সৃষ্ট অসহায় মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, চরিত্র ও নৈতিকতা সবকিছু ধ্বংস করে ফেলছে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেবার কেউ নেই কেন? এজন্য যে, রাষ্ট্রযন্ত্র বিপর্যস্ত হয়েছে, শক্তিমান লোকেরা নিজেরাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা নিজেরা তো যুলুম করেই, পরন্তু অন্যান্য যালেমকেও সাহায্য করে। মোটকথা দেশে দেশে যে যুলুমই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার একমাত্র কারণ এই যে, সাম্প্রতিক সরকার এরই পক্ষপাতী এবং নিরবে সহ্য করে।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমস্ত বিপর্যয়ের মূল উৎস হচ্ছে হুকুমতের খারাবী। মানুষের মত ও চিন্তার খারাপ হওয়া, আকীদা বিকৃত হওয়া, মানবীয় শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতার ভ্রান্ত পথে অপচয় হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যেও মারাত্মক নীতি-প্রথার প্রচলন হওয়া, যুলুম, না-ইনসাফী ও কুৎসিত কাজ-কর্মের প্রসার লাভ হওয়া এবং বিশ্বমানবের ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সবকিছুরই মূল কারণ একটি এবং তা এই যে, সমাজ ও সরকারের নেতৃত্ব, শক্তি সবই আজ অনাচারী ও দুরাচারী লোকদের হাতে চলে গেছে। আর শক্তি ও সম্পদের চাবিকাঠি যদি খারাপ লোকদের হাতে থাকে এবং জীবিকা নির্বাহের সমস্ত উপায়ও যদি তাদেরই করায়ত্ব হয়ে থাকে তবে শুধু যে তারাই আরও খারাপ হয়ে যাবে তাই নয় বরং সমগ্র দুনিয়াকে আরও অধিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে, তাদের সাহায্য ও সমর্থনের সর্বব্যাপী বিপর্যয় আরও মারাত্মকভাবে জেগে উঠবে। বস্তুতঃ তাদের হাতে শক্তি থাকা পর্যন্ত আংশিক সংশোধনের জন্য হাজার চেষ্টা করলেও তা সফল হতে পারে না, একথা একেবারে সুস্পষ্ট।

এ বুনিয়াদী কথাটি বুঝে নেয়ার পর মূল বিষয়টি অতি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। মানুষের দূরবস্থা দূর করে এবং আসন্ন ধ্বংস থেকে তাদেরকে রক্ষা করে এক মহান কল্যাণকর পথে পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সরকারের কর্মনীতিকে সুসংবদ্ধ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ হতে পারে না। একজন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও একথা বুঝতে পারে যে, যে দেশের লোকদের ব্যভিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সেখানে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে হাজার ওয়াজ করলেও তা কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি দখল করে যদি ব্যভিচার বন্ধ করার জন্য বল প্রয়োগ করা হয়, তবে জনসাধারণ নিজেরাই হারাম পথ পরিত্যাগ করে হালাল উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। মদ, গাঁজা, সুদ, ঘুষ, অশ্লীল সিনেমা-বায়স্কোপ, অর্ধনগ্ন পোষাক, নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা এবং এ ধরনের যাবতীয় পাপ প্রচলনকে নিছক ওয়াজ-নসিহত দ্বারা বন্ধ করতে চাইলে তা কখনও সম্ভব হবে না। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে চাইলে তা কখনো সম্ভব হবে না। যারা জনসাধারণকে শোষণ করে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করে, তাদেরকে শুধু মৌখিক কথা দ্বারা লাভজনক কারবার থেকে বিরত রাখা যাবে না। কিন্তু শক্তি লাভ করে যদি অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে চেষ্টা করা হয় তবে অতি সহজেই সমস্ত পাপের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের শ্রম, মেহনত, সম্পদ, প্রতিভা ও যোগ্যতার এই অপচয় যদি বন্ধ করতে হয় এবং সেগুলোকে সঠিক ও সুস্থ পথে প্রয়োগ করতে হয়, যুলুম বন্ধ করে যদি বিচার-ইনসাফ কায়েম করতে হয়, দুনিয়াকে ধ্বংস এবং ভাঙ্গনের করাল গ্রাস ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করে মানুষকে যদি বাঁচাতে হয়, অধঃপতিত মানুষকে উন্নত করে সমস্ত মানুষকে যদি সমান মান-সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে শুধু মৌখিক ওয়াজ নসীহত দ্বারা এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য এ জন্য যদি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে তা খুবই সহজে সম্পন্ন হতে পারে। অতএব এতে আর কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজ সংস্কারের কোন প্রচেষ্টাই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ ছাড়া সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। একথা আজ এতই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা বুঝার জন্য খুব বেশী চিন্তা-গবেষণার আবশ্যক হয় না। আজ দুনিয়ার বুক থেকে প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদ দূর করতে চাইবে এবং দুনিয়ার মানুষের দুরাবস্থা দূর করে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করতে অন্তর দিয়ে কামনা করবে তার পক্ষে আজ শুধু ওয়ায়েজ ও উপদেশদাতা হওয়া

একেবারেই অর্থহীন। আজ তাকে উঠতে হবে এবং ভ্রান্ত নীতিতে স্থাপিত সরকার ব্যবস্থাকে খতম করে দিয়ে, ভ্রান্ত নীতি অনুসারী লোকদের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নিয়ে সঠিক নীতি এবং খাঁটি (ইসলামী) নীতির রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে হবে।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর আর এক কদম সামনে অগ্রসর হোন৷ একথা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার মানুষের জীবনে যত কিছু খারাবী ও অশান্তি প্রসারিত হচ্ছে, তার মূলীভূত কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের ভ্রান্তি৷ এবং একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সংশোধন যদি করতে হয়, তবে এর মূল শিকড়ের সংশোধন করতে হবে সর্বাগ্রে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, স্বয়ং রাষ্ট্র ও সরকারের দোষ-ক্রটির মূল কারণ কি এবং কোন্ মৌলিক সংশোধনের দ্বারা সেই বিপর্যয়ের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করা যেতে পারে?

এর একমাত্র জবাব এই যে, আসলে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ। অতএব সংশোধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে হবে৷ এতবড় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে যতই খোঁজ ও অনুসন্ধান করা হবে, এই একটি মাত্র কথাই এর সঠিক জবাব হতে পারে বলে বিবেচিত হবে৷

একটু চিন্তা করে দেখুন, যে দুনিয়ায় মানুষ বাস করে তা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? পৃথিবীর এই মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের এ সীমাসংখ্যাহীন উপায়-উপাদান আল্লাহ্ সংগ্রহ করে দেন, না অন্য কোন শক্তি? এ প্রশ্নগুলোর একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোন উত্তর বস্তুতঃই হতে পারে না যে, পৃথিবীর মানুষ এবং এ সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন৷ অন্যকথায় এ পৃথিবী আল্লাহর, ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই প্রজা। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাজ্যে অপরের হুকুম চালাবার কি অধিকার থাকতে পারে? আল্লাহর 'প্রজা' সাধারণের উপর আল্লাহ ছাড়া অন্যের রচিত আইন কিংবা স্বয়ং প্রজাদের রচিত আইন কি করে চলতে পারে? দেশ ও রাজ্য হবে একজনের আর সেখানে আইন চলবে অপরের। মালিকানা হবে একজনের আর মালিক হয়ে বসবে অন্য কেউ? প্রজা হবে একজনের আর তার উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য কারো? মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি একথা কেমন করে স্বীকার করতে পারে? বিশেষত এ কথাটাই প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যেহেতু এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ, তাই যখনই এবং যেখানেই এরূপ হয়েছে সেখানে তারই পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে। যেসব মানুষ আইন প্রণয়ন ও প্রভুত্ব করার অধিকার লাভ করে তারা নিজেরা স্বাভাবিক মূর্খতা ও অক্ষমতার দরুনই নানারূপ বিরাট বিরাট ভুল করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকটা নিজেদের পাশবিক লালসার বশঃবর্তী হয়ে ইচ্ছা করে যুলুম ও অবিচার করতে শুরু করে। তার প্রথম কারণ এই যে, মানবীয় সমস্যা ও ব্যাপার সমূহের সুষ্ঠু সমাধান ও পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নির্ভুল নিয়ম-কানুন রচনা করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিদ্যাই তাদের থাকে না। দ্বিতীয়তঃ তাদের মনে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার আতঙ্ক আদৌ থাকে না বলেই তারা একেবারে বল্গাহারা পশু হয়ে যায় এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। যে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় একবিন্দু থাকবে না এবং কোন উচ্চতর শক্তির কাছে জবাবদিহি করার চিন্তাও যার হবে না; বরং যার মন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হবে যে, 'আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই' -এ ধরনের মানুষ যখন শক্তি লাভ করবে, তখন তারা যে বল্গাহারা হিংস্র পশুতে পরিণত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? একথা বুঝার জন্য খুব বেশী বুদ্ধি-জ্ঞানের আবশ্যক করে না। এসব লোকের হাতে যখন মানুষের জীবন-প্রাণ এবং রিযিক ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এসে পড়বে, যখন কোটি কোটি মানুষের মস্তক তাদের সামনে অবনমিত হবে, তখন তারা সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের আদর্শ রক্ষা করে চলবে এমন আশা কি কিছুতেই করা যায়? তারা পরের হক কেড়ে নিতে, হারাম উপায়ে ধন লুণ্ঠন করতে এবং আল্লাহর বান্দাহগণকে নিজেদের পশু বৃত্তির দাসানুদাস বানাতে চেষ্টা করবে না, এ ভরসা কিছুতেই করা যেতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজেরা সৎপথে থাকবে এবং অন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এমন কোন যুক্তি আছে কি? কখনও নয়। মূলতঃই তা সম্ভব হতে পারে না, হওয়া বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী৷ হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে৷ বর্তমান সময়েও যাদের মনে অল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহির আতঙ্ক নেই, তারা শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করে কত যুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার চরম শত্রুতা করতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ চোখ খুললেই দেখতে পাওয়া যায়।

কাজেই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির গোড়াতেই সর্বাত্মক আঘাত হানতে হবে৷ অর্থাৎ, মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব ক্ষমতাকে নিমূর্ল করে তথায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার স্থাপিত করতে হবে।

অতপর যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের বুনিয়াদে হুকুমাত কায়েম করবে ও চালাবে তারা নিজেরা কখনই রাজাধিরাজ ও একচ্ছত্র প্রভু হয়ে বসতে পারবে না- আল্লাহকেই একমাত্র বাদশাহ স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধি হয়েই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করতে হবে। এ দায়িত্ব হলো তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত মহান আমানত। একথা তদের অবশ্যই মনে করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন তাদের এ আমানতের হিসেব দিতে হবে সেই মহান আল্লাহর সমীপে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য- সবকিছুই জানেন। রাষ্ট্রের বুনিয়াদী আইন হবে আল্লাহর দেয়া বিধান। কারণ তিনি সবকিছুরই নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত- সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর আইন ও বিধানের এক বিন্দু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো থাকবে না। তাহলেই তারা মানুষের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং অবাঞ্ছিত পাশবিক লালসার অনধিকার চর্চা থেকে চিরকাল সুরক্ষিত থাকতে পারবে। ইসলাম এ মূল সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েই দুনিয়ায় এসেছে। সমগ্র বিপর্যায়ের মূল উৎসকেই এটা এমনিভাবে সংশোধন করতে চায়৷ আল্লাহকে যারা নিজেদের বাদশাহ-কেবল মৌখিক আর কাল্পনিক বাদশাই নয়-প্রকৃত বাদশাহ বলে স্বীকার করবে এবং তিনি তাঁর নবীর মধ্যস্থতায় যে বিধান দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাকে যারা বিশ্বাস করবে ইসলাম তাদের কাছে এ দাবী উত্থাপন করে যে, তারা যেন তাদের বাদশাহর রাজ্যে তার আইন ও বিধান জারি করার জন্য সচেষ্ট হয়। সেই বাদশাহর যে সব প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে এবং নিজেরাই রাজাধিরাজ হয়ে বসেছে তাদের শক্তি ক্ষুন্ন করতে হবে, আর আল্লাহর প্রজাবৃন্দকে অন্য শক্তির 'প্রজা' হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহকে 'আল্লাহ' এবং তাঁর আইনকে জীবন বিধান বলে কেবল স্বীকার করাই ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়; বরং সেই সাথে এ কর্তব্যও আপনা আপনিই তাদের উপর আবর্তিত হয় যে, তোমরা যেখানেই বাস কর, যে দেশ বা রাজ্যেই তোমাদের বাসস্থান হোক না কেন সেখানেই মানুষের সংশোধন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেখানকার ভ্রান্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলিয়ে সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে৷ আল্লাহদ্রোহী নাস্তিক ও আল্লাহ্ নির্দিষ্ট সীমালংঘনকারী লোকদের হাত থেকে আইন রচনা ও দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরকালে জবাবদিহির জাগ্রত অনুভূতি সহকারে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করেই রাষ্ট্রীয় কার্যসম্পন্ন কর। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করার নামই জিহাদ।

প্রভুত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার মূলতঃই অত্যন্ত জটিল, দায়িত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নেই। তা লাভ করার বাসনা কারো মনে জাগ্রত হলেই তার মধ্যে স্বভাবতই লালসার লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে। পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ হলেই মানুষের মধ্যে সুপ্ত লালসা জেগে উঠে, তখন মানুষের উপর নিরংকুশ প্রভুত্ব বিস্তারের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা খুব কঠিন কাজ নয়; কিন্তু তা লাভ করার পর নিজে আল্লাহ্ না হয়ে 'আল্লাহর অনুগত দাস' হিসেবে কর্তব্য পালন করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার। কাজেই এক ফির'আউনকে পদচ্যুত করে তুমি নিজে যদি সেখানে 'ফির'আউন' হয়ে বস, তাহলে আসলে লাভ কিছুই হলো না। কাজেই এ বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ইসলাম তোমাকে সে জন্য সর্বতোভাবে তৈরী করে দেয়া অপরিহার্য মনে করে৷ স্বয়ং তোমার মন ও মগয থেকে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা দূর না হলে, তোমার মন ও আত্মা নির্মল না হলে, নিজের বা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে লড়াই করার পরিবর্তে খালেস ভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সাধনা ও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না হলে; উপরন্তু রাষ্ট্রশক্তি লাভ করার পর নিজের লোভ-লালসা ও দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ্ হয়ে বসার পরিবর্তে প্রাণে ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা না জন্মালে রাষ্ট্র শক্তি লাভের দাবী উত্থাপন করা এবং দুনিয়ার বাতিল শক্তির সাথে লড়াই শুরু করে দেয়ার কোন অধিকার কারো থাকতে পারে না।

কালেমা পড়ে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করলেই ইসলাম তোমাকে মানুষের উপর আক্রমন করার অধিকার বা অনুমতি দেয় না। কারণ, তখন তুমিও ঠিক সেই দুষ্কার্য করতে শুরু করবে; যা করছে দুনিয়ার বর্তমান আল্লাহদ্রোহী ও যালেম লোকাগণ। বরং এতবড় বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেয়ার পূর্বে ইসলাম তোমার মধ্যে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে চায়।

বস্তুতঃ ইসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সেই ট্রেনিং- এ উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইসলামও তার কর্মচারীদের

সর্বপ্রথম এক বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়৷ তারপরই তাদের জিহাদ ও ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে এ উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে৷ দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর্মচারীদের যে কাজে নিযুক্ত করে থাকে তাতে নির্মল নৈতিক চরিত্র, মনের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টির কোনই আবশ্যক হয় না। এ জন্য তাদেরকে কেবল সুদক্ষ করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। আর সুদক্ষ হওয়ার পর সে যদি ব্যভিচারী হয়, মদ্যপায়ী হয়, বেঈমান ও স্বার্থপর হয় তবুও তাতে কোনরূপ আপত্তির কারণ নেই৷ কিন্তু ইসলাম তার কর্মীদের উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তা আগা গোড়া সবই হচ্ছে একান্তভাবে নৈতিক কাজ৷ অতত্রব ইসলামে তাদের সুদক্ষ করে তোলার দিকে যতখানি লক্ষ্য দেয়া হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মন ও আত্মাকে পবিত্র করার দিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী। ইসলাম তাদের মধ্যে এতখানি শক্তি জাগাতে চায় যে, যখন তারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর হুকুমাত কায়েম করার দাবী নিয়ে উঠবে, তখন যেন তারা নিজেদের এ দাবীর ঐকান্তিকতা ও সততা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাতে পারে৷ তারা যেন কখনই নিজেদের ধন-দৌলত, জমি-জায়গা, দেশ ও রাজ্য, সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করার জন্য লড়াই না করে৷ তারা যেন খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আল্লাহর কোটি কোটি বান্দার জন্য লড়াই করে, আর একথা যেন কাজকর্মের ভেতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বিজয়ী হলে যেন অহংকারী, দাম্ভিক ও আল্লাহদ্রোহী না হয়, তখনও যেন তাদের বিনয়াবনত মস্তক আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকে। তারা শাসক হলে মানুষকে যেন তারা নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত না করে৷ বরং নিজেরাই যেন আল্লাহর গোলাম হয়ে জীবন যাপন করে৷ আর আন্যান্য মানুষকেও যেন একমাত্র আল্লাহর দাস বানাতে চেষ্টা করে৷ তারা রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করে থাকলে তা যেন কেবল নিজের বা নিজের বংশের কিংবা জাতীয় লোকদের পকেট বোঝাই করার কাজে উজাড় করে না দেয়৷ তারা যেন অল্লাহর ধনভাণ্ডারকে তাঁরই বান্দাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন করে দেয় এবং একজন খাঁটি আমানতদারের ন্যায় একথা স্মরণ রেখে কাজ করে যে, এক অদৃশ্য চোখ তাকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে- ওপরে কেউ আছে, যার দৃষ্টি হতে সে কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে সক্ষম নয় এবং তারই কাছে তাকে এক এক করে পয়সার হিসাব দিতে হবে৷

বস্তুতঃ মানুষকে এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা ইসলামের নির্দিষ্ট এই ইবাদাতগুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হতে পারেনা। আর ইসলাম মানুষকে এভাবে গঠন করে বলেঃ এখন তোমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নেক ও সালেহ বান্দাহ, তোমরা সামনে অগ্রসর হও লড়াই সংগ্রাম করে আল্লাহদ্রোহী লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুত কর এবং সকল ক্ষমতা ও অধিকার নিজেদের হস্তগত করে নাও।

সহজেই বুঝতে পারা যায়, যেখানে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আদালত, জেল ও কর ধার্য্যকরণ ইত্যাদি সকল সরকারী কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ আল্লাহভীরু হবে, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে সচেতন হবে, যেখানে রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনার সমস্ত নিয়ম-কানুন আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে রচিত হবে, সেখানে অবিচার ও অজ্ঞতার কোন অবকাশ নেই, যেখানে পাপ ও পাপানুষ্ঠানের সমস্ত পথ যথাসময়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, সরকার নিজেই শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে ন্যায়, পুণ্য ও পবিত্র ভাবধারার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়৷ তথায় মানবতা যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে পারবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারেনা৷ এ ধরনের সরকার যদি ক্রমাগত চেষ্টা-যত্নের সাহায্যে কিছুকাল পর্যন্ত লোকদের চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতি গঠন করতে নিযুক্ত থাকে, হারাম পন্থায় অর্থলাভ, পাপ, যুলুম, নির্লজ্জতা ও নৈতিক চরিত্রহীনতার সকল উৎস বন্ধ করে দেয়া হয়, ভুল-ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতি বন্ধ করে সুস্থ ও নিখুঁত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা লোকদের মনোভাব ও চিন্তাধারা তৈরী করতে থাকে, তবে তার অধীনে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি, নিরাপত্তা, সচ্চরিত্র ও সৎপ্রকৃতির পবিত্র পরিবেশে মানুষ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করবে; তখন মানুষের আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে৷ পাপিষ্ঠ ও আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বাধীনে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে যে চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা স্বতঃই সত্যদ্রষ্টা ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠবে৷ নৈতিক পঙ্কিলতার মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকার দরুন যে অন্তর মসীলিপ্ত ও মলিন হয়ে গেছে; ধীরে ধীরে তা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং সত্যের প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা জেগে উঠবে৷ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে সকলের একমাত্র রব, তিনি ছাড়া আর কেউ যে বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে নবীজীর মারফত এ সত্যের পয়গাম লাভ হয়েছে, তিনি যে সত্য ও সত্যবাদী নবী -এ তথ্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা তখনকার পরিবেশে সকলের পক্ষে সহজ হবে৷ আজ যে কথা বুঝিয়ে দেয়া খুবই কঠিন মনে হয়, তখন তাই সকলের মগযে আপনা-আপনি স্থান লাভ করবে৷ আজ বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের সাহায্যে যে কথা বুঝানো যায় না, তখনকার দিনে সেই কথা এতদূর সহজবোধ্য হবে যে, তাতে নামমাত্র জটিলতা অনুভূত হবে না।

মানুষের মনগড়া মত ও পথ অনুযায়ী কাজ-কর্ম সম্পন্ন হওয়া এবং আল্লাহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা যারা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, আল্লাহর পরিপূর্ণ একত্ব (তাওহীদ) এবং তার পয়গাম্বরের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাদের পক্ষে খুবই সহজ এবং তা অবিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। বস্তুত, ফুল ও কাঁটার পার্থক্য জেনে নেয়ার পর ফুল আহরণ করা সহজ এবং কাঁটা সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে থাকে। তখনকার দিনে ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করা এবং কুফর ও শির্ককে আঁকড়ে থাকা বড়ই কঠিন হবে। সম্ভবতঃ খুব বেশী হলেও হাজারে দশজন লোকের মধ্যেই এতখানি গোঁড়ামী পাওয়া যেতে পারে; তার বেশী নয়।

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যে কোন্ বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ফরয করা হয়েছে, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকগণ তা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছেন। যদিও আজ পর্যন্ত এগুলোকে নিছক পূজা অনুষ্ঠানের ন্যায়ই মনে করা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ভ্রান্ত ধারণাই বদ্ধমূল করে রাখা হয়েছে। এটা যে একটি বিরাট ও উচ্চতর কাজের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত প্রচার করা হয়নি। এ কারণেই মুসলমানগণ নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই এ অনুষ্ঠান উদযাপন করে আসছে; কিন্তু মূল কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কোন ধারণাই মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। যদিও মূলতঃ এর জন্যই এ ইবাদাতসমূহ ফরজ হয়েছে; কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, জিহাদের বাসনা না হলে এবং জিহাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করলে এ ইবাদাতসমূহ একেবারে অর্থহীন। এ ধরনের অর্থহীন অনুষ্ঠান পালন করে যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব মনে করা হয়, তবে বিচারের দিন এর সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে।

জিহাদের গুরুত্ব

ইতি পূর্বে বিভিন্ন পুস্তিকায় দ্বীন, শরীয়ত ও ইবাদাত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষা সমূহের বিস্তারিত অর্থ লিখিত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ তার দিকে সামান্য ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে।

'দ্বীন' অর্থ আনুগত্য করা,

আইনকেই বলা হয় শরীয়ত

ইবাদত অর্থ বন্দেগী ও দাসত্ব।

আপনি কারো আনুগত্য স্বীকার করলে এবং তাকে নিজের শাসক ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিলে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি তার 'দ্বীন' গ্রহণ করেছেন। পরন্তু আপনি যখন তাকে নিজের বিধান দাতা হিসেবে স্বীকার করলেন এবং কার্যতঃ আপনি তার প্রজা হলেন তখন তাঁর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-পন্থা আপনার জন্য আইন কিংবা শরীয়তের মর্যাদা পেল। এমতাবস্থায় আপনি তার 'শরীয়ত' অনুযায়ী জীবন যাপন করেন, তিনি যা কিছুর দাবী করেন আপনি তা পূরণ করেন, তার প্রত্যেকটি হুকুম আপনি পালন করেন, তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, যে সীমার মধ্যে থেকে আপনার কাজ করা তিনি সঙ্গত ঘোষণা করবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকে আপনি কাজ করতে থাকেন, শুধু তাই নয়, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, কাজ-কর্ম, আত্মীয়তা-শত্রুতা ও মামলা-মোকদ্দমা সব কিছুই তার নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করেন। তারই মত ও ফয়সালাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন ও তার সামনে মাথা নত করেন, কাজেই আপনার এ আচরণকে তার ইবাদাত বা বন্দেগী বলে অভিহিত করা যাবে।

এ বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়, শরীয়ত হচ্ছে এর আইন এবং এর আইন ও নিয়ম-প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদাত। আপনি যাকেই শাসক ও নিরংকুশ রাষ্ট্র-কর্তা রূপে মেনে তার অধীনতা স্বীকার করবেন, আপনি মূলতঃ তারই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনার এ শাসক ও রাষ্ট্র-কর্তা যদি আল্লাহ্ হন তবে আপনি তাঁর দ্বীনের অধীন হলেন, তিনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হন, তবে বাদশাহর 'দ্বীন'কেই আপনার কবুল করা হবে। বিশেষ কোন জাতিকে এ মর্যাদা দিলে সেই জাতিরই 'দ্বীন' গ্রহণ করা হবে। আর আপনার নিজের জাতি বা নিজ দেশের জনগণকে সেই অধিকার দিলে জনগণের 'দ্বীন'কেই আপনি গ্রহণ করলেন। মোটকথা, যারই আনুগত্য করবেন, প্রকৃতপক্ষে আপনি তারই 'দ্বীন' পালন করতে থাকবেন এবং যারই আইন আপনি মেনে চলবেন, মূলতঃ তারই ইবাদত করা হবে।

একথার পরে এ সহজ কথাটিও বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, একজন মানুষ একই সময়কালে দু'টি 'দ্বীন' কোন রূপে পালন করতে পারেনা। বিভিন্ন শাসকের মধ্যে এক সময়ে মূলতঃ ও কার্যত একজনকেই অনুসরণ করা সম্ভব। বিভিন্ন আইনের মধ্যে একটি আইন মানুষের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং অসংখ্য মা'বুদের মধ্যে একজনেরই ইবাদাত করা আপনার পক্ষে সম্ভব। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমরা একজনকে শাসনকর্তা মানবো আর বাস্তব ক্ষেত্রে আনুগত্য করবো অপর জনের এবং বন্দেগী করব তৃতীয় একজনের আইন অনুসারে, এতে আপত্তি কি থাকতে পারে? এর উত্তর এই যে, এটা হতে পারে- বস্তুতঃ এখন চার দিকে এটাই হচ্ছে। কিন্তু জেনে রাখুন, এটা পরিষ্কার শির্ক, আর শির্কের সবটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি যারই আইন পালন করে চলবেন, মূলতঃ তারই 'দ্বীন' আপনার পালন করা হবে। অতএব, যার আনুগত্য আপনি করেন না তাকে শাসনকর্তা এবং তার 'দ্বীন'কে নিজের 'দ্বীন' বলে প্রকাশ করা বিরাট মিথ্যা ছাড়া কিইবা হতে পারে? মুখে একথা প্রকাশ করলে কিংবা মন দিয়ে তা বুঝতে থাকলে তাতে লাভ কি এবং বাহ্য জগতে তার কিইবা ফল পাওয়া যায়? আপনার জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম যখন একজনের শরীয়ত নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে, আর কার্যতঃ আপনি অপর কারো শরীয়ত পালন করতে থাকেন, তখন সেই শরীয়ত মেনে চলা সম্পর্কে আপনার দাবী কি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায় না? বাস্তবক্ষেত্রে আপনি যখন এক জনের বন্দেগী করেন তখন অন্য কাউকে নিজের মা'বুদ বলে প্রচার করা এবং নিজের মস্তক তার সামনে অবনত করা কি একটি কৃত্রিম ব্যাপারে পরিণত হয় না? কারণ, প্রকৃতপক্ষে আপনি তারই হুকুম পালন করে চলেন, তারই নিষিদ্ধ কাজ থেকে আপনি বিরত থাকেন, তারই

নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সকল কাজ সম্পন্ন করেন এবং তারই উপস্থাপিত নিয়ম-পন্থা আপনি বাস্তব ক্ষেত্রে পালন করে চলেন। নিজেদের মধ্যে লেনদেনও তারই দেয়া নিয়ম-নীতি অনুসারে করে থাকেন। আপনার যাবতীয় ব্যাপারে ও কাজকর্মে আপনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংগঠন এবং অধিকার বন্টনের কাজও তারই দেয়া বিধান অনুযায়ী করে থাকেন। শুধু তাই নয় তারই দাবী ও নির্দেশ অনুযায়ী আপনি আপনার মন-মগজ ও হাতপায়ের সমগ্র শক্তি, প্রতিভা, শ্রমোপার্জিত সমস্ত ধন-সম্পদ এবং সবশেষে নিজের মহামূল্যবান জীবন-প্রাণ পর্যন্ত তার সামনে পেশ করে থাকেন। অতএব, আপনার কাজ যদি আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত হয়, তবে আপনার বাস্তব কাজই হবে আসল ধর্তব্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় নিছক আকীদা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, তা হিসেবের মধ্যে আসতে পারে না। এমন আকীদা-বিশ্বাসের গুরুত্বইবা কি হতে পারে- বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই? বাস্তব ক্ষেত্রে একজন লোক যদি বাদশাহর 'দ্বীন' মেনে চলে, তবে আল্লাহর 'দ্বীনের' কোন স্থানই সেখানে হতে পারে না। অনুরূপভাবে বাস্তব কাজ-কর্ম যদি জনগণের 'দ্বীন' কিংবা ইংল্যান্ড, জামার্ন দেশ ও রাজ্যের 'দ্বীন' পালন করা হয়, তবে সেখানেও আল্লাহর 'দ্বীনের' আদৌ কোন স্থান হাতে পারেনা। পক্ষান্তরে আপনি যদি আল্লাহর 'দ্বীন' মেনে চলেন তবে অন্যান্য কোন দ্বীনের স্থানই সেখানে হবে না। এক কথায় এটা চূড়ান্তভাবে মনে রাখা দরকার যে, শির্ক নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর কোন দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা ছাড়া আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপলব্ধি করতে পরবেন যে, 'দ্বীন' যাই এবং যে ধরনেরই হোক না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারী কর্তৃত্ব ছাড়া তার কোন মূল্য নেই। গণ-দ্বীন, শাহী-দ্বীন, কমিউনিষ্ট-দ্বীন কিংবা আল্লাহর দ্বীন যা-ই হোক না কেন, একটি দ্বীনেরও প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। প্রাসাদের শুধু কাল্পনিক চিত্র-যার বাস্তব কোন অস্তিত্বই নেই-যেমন অর্থহীন, অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সরকার ছাড়া একটি দ্বীন(এবং জীবনব্যবস্থা)ও সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আপনি যখন বাস করবেন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে, তারই দ্বারে প্রবেশ করবেন, তা থেকে বের হবেন, তার ছাদ ও প্রাচীরের ছায়া আপনাকে আশ্রয় দান করবে, তখন এক কাল্পনিক প্রাসাদের রঙীন চিত্র হতে কি ফায়দা আপনি আশা করতে পারেন। আপনাকে তো বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ অনুযায়ী। পরন্ত একটি চিত্র অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদে বসবাস শুরু করে অন্য প্রাসাদের চিত্র কল্পনা করা কিংবা তার প্রতি নিছক একটা ভক্তি বা বিশ্বাস রাখার বাস্তব ক্ষেত্রে কি ফল পাওয়া যেতে পারে? একটি কাল্পনিক প্রাসাদ মনের মধ্যে রেখে বাস্তব বসবাস অন্য কোন প্রাসাদে করা কতখানি হাস্যকর ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। মস্তিষ্কের মধ্যে যে প্রাসাদের কাল্পনিক চিত্র রয়েছে, তাকে কখনো প্রাসাদ বলা যায় না, আর তাতে বসবাস করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ উদাহরণ অনুযায়ী কোন দ্বীনকে 'সত্য দ্বীন' হিসেবে শুধু বিশ্বাস করার কোনই অর্থ হয় না। মানুষ যখন বাস্তব জীবন যাপন করবে একটি 'দ্বীন' অনুসারে তখন অন্য কোন 'দ্বীন'কে কাল্পনিকভাবে বিশ্বাস করা একেবারেই অর্থহীন। কাল্পনিক 'দ্বীন'কেও অনুরূপভাবে 'দ্বীন' বলা যায় না এবং কল্পিত প্রাসাদের ন্যায় কাল্পনিক 'দ্বীন'কেও কেউ প্রকৃত 'দ্বীন' রূপে গ্রহণ করতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে যার ক্ষমতা স্বীকৃত ও কর্তত্ব স্থাপিত হবে, যার আইন কার্যতঃ চলবে এবং যার দেয়া ব্যবস্থানুযায়ী মানব জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন হবে, বস্তুতঃ দ্বীন তার হবে। অতএব প্রত্যেক দ্বীন স্বভাবতঃই নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে এবং দ্বীন এ জন্যই হয় যে, তা যে ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বন্দেগী, দাসত্ব ও আইন পালনও একমাত্র তারই হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছেঃ

'গণ-দ্বীন'-এর অর্থ কি? একটি দেশের অধিবাসী জনগণই সেখানে নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভুত্বের মালিক হয়, তাদের নিজেদের রচিত আইনই তাদের উপর জারী হয় এবং দেশের সমগ্র অধিবাসী সম্মিলিতভাবে নিজেরদের গণ-শক্তির আনুগত্য ও দাসত্ব করে- বস্তুতঃ তাই হচ্ছে গণ-দ্বীন বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কাজেই দেশের প্রকৃত ক্ষমতায় যতদিন জনগণ রচিত আইন জারী না হয়, ততদিন পর্যন্ত এ গণ-দ্বীন বা গণ-রাষ্ট্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত হলো বলে মনে করাও যায় না। কিন্তু জনগণের পরিবর্তে দেশের শক্তি প্রভুত্ব যদি কোন ভিন্ন জাতি কিংবা কোন বাদশাহ করায়ত্ব করে নেয় এবং সারা দেশে তারই রচিত আইন জারী হয়, তবে গণ-দ্বীন এর অস্তিত্ব কোথায় থাকবে? সেখানে কেউ যদি গণ-দ্বীন বা রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তবে তার কি মূল্য হতে পারে? কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ কিংবা ভিন্ন জাতির দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সে গণ-রাষ্ট্রের অনুসরণ করতে পারে না।

শাহী-দ্বীনের কথাই ধরা যাক। এ দ্বীন অনুযায়ী যে বাদশাহ উচ্চতর কর্তা ও প্রভু নিধারিত হয়, তার আনুগত্য ও ইবাদাত করা এবং তার আইন বাস্তবে জারী করাই তার মূল লক্ষ্য। তাই যদি না হয় তবে বাদশাহকে বাদশাহ মানলে এবং তাকে শ্রেষ্ঠ প্রভু স্বীকার করলে বাস্তবে কি লাভ হবে? বাস্তব ক্ষেত্রে যদি গণ-দ্বীন বা গণ-রাষ্ট্র কিংবা ভিন্ন জাতির শাসন স্থাপিত হয় তাহলে 'শাহী-দ্বীন' থাকলো কোথায়? তার অনুসরণই বা কে করতে পারে?

বেশী দিনের কথা নয়, এ দেশে (অধুনা তিরোহিত) ইংরেজের দ্বীন বা রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজের শক্তি ও প্রভুত্বের মারফতে ভারত শাসন আইন ও দেওয়ানী আইন জারী ছিল বলেই তো এ দ্বীন চলছিল। দেশবাসীর সমস্ত কাজ-কর্ম ইংরেজের নিধার্রিত নিয়ম-পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো। সকল মানুষ তারই হুকুম মাথা নত করে পালন করতো। এ দ্বীন এতখানি শক্তি সহাকারে যতদিন পর্যন্ত স্থাপিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত এখানে অন্য কোন দ্বীনের বস্তুতঃই কোন স্থান ছিল না। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও দেওয়ানী কার্যবিধি রহিত হয়ে গেলে এবং ইংরেজের আইন পালন ও কার্যত তার দাসত্ব না করা হলে ইংরেজ রাষ্ট্র বা দ্বীন কোথায় থাকবে? বস্তুতঃ দ্বীন ইসলামের অবস্থাও ঠিক এরূপ। এ দ্বীনের মূল কথা এই যে, পৃথিবীর মালিক ও সমগ্র মানুষের একমাত্র বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। কাজেই আনুগত্য ও দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করতে হবে এবং তাঁর দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী মানব জীবনের সকল প্রকার কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। ইসলাম কর্তৃক স্থাপিত এ মত-উচ্চতর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর-কেবলমাত্র এজন্যই পেশ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহরই আইন চলবে, অন্য কারো নয়। আদালতের বিচার তাঁর বিধান অনুযায়ী হবে, পুলিশ তাঁরই বিধান জারী করবে। লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় কাজ-কর্ম, লেন-দেন ইত্যাদি তাঁর বিধান অনুসারে সম্পন্ন হবে। তাঁরই মর্জি অনুযায়ী 'কর' নিধার্রিত হবে- তার ব্যয়ও হবে একমাত্র তাঁরই দেয়া রীতিনীতি অনুযায়ী। সিভিল সার্ভিস এবং সৈন্য বিভাগ তাঁরই হুকুমের অধীন হবে। সকল লোক ভয় করবে, অন্তরের সাথে সমীহ করে চলবে, দেশের প্রজা সাধারণ একমাত্র তাঁরই অনুগত হবে। এক কথায় মানুষ আল্লাহ ভিন্ন কারো দাসত্ব বরণ করবে না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, খাঁটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত না হলে উক্ত উদ্দেশ্য কিছুতেই লাভ করা যেতে পারে না। অন্য কোন দ্বীনের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই, অংশীদারিত্বও নেই, আর সত্য কথা এই যে, কোন 'দ্বীন'ই অন্য দ্বীনের অংশীদারিত্ব বরদাশত করতে পারে না। অন্যান্য দ্বীনের ন্যায় দ্বীন ইসলামও এ দাবী করে যে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরংকুশভাবে কেবলমাত্র আমারই হবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি 'দ্বীন'ই আমার সামনে অবনত পরাজিত থাকবে। অন্যথায় আমার অনুসরণ কি করে সম্ভব হতে পারে? আমার দ্বীন 'গণ-দ্বীন' হবে না, 'শাহী-দ্বীন' হবে না, 'কমিউনিষ্ট-দ্বীন' হবে না। অপর কোন দ্বীনেরই অস্তিত্ব থাকবে না। পক্ষান্তরে অন্য কোন দ্বীনের অস্তিত্ব থাকলে আমি থাকবো না। তখন আমাকে শুধু মুখেই সত্য বলে স্বীকার করলে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যাবে না। কুরআন মজীদ বার বার এ কথারই ঘোষণা রয়েছেঃ

...وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"লোকদের শুধু এ হুকুমই দেয়া হয়েছে (এছাড়া অন্য কোন নির্দেশই দেয়া হয়নি) যে, তারা সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে।" [সূরা আল-বাইয়্যেনাহঃ ৫]

.هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি তাঁর রাসূলকে জীবন ব্যবস্থা ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন এ জন্য যে, একে সমগ্র দ্বীনের উপর জয়ী করে দেবেন; যদিও শির্কবাদীগণ এটা মোটেই বরদাশত করে না।" [সূরা আত্-তাওবাঃ ৩৩]

.وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতদিন না ফেৎনা নির্মূল হয়ে যায় এবং 'দ্বীন' সামগ্রীকভাবে আল্লাহ তা'আলারই স্থাপিত হয়।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩৯]

..إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই। তাঁরই নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না।" [সূরা ইউসুফঃ ৪০]

.فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

"যে ব্যক্তি নিজের রবের সাক্ষাত লাভ করতে ইচ্ছুক সৎকাজ করা এবং রবের ইবাদাতের ব্যাপারে অপর কাউকে শরীক না করা তার একান্তই কর্তব্য।" [সূরা আল-কাহাফঃ ১১০]

بِمَا آمَنُوا أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ أَنْ يُرِيدُونَ قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ وَمَا إِلَيْكَ أُنْزِلَ أُمِرُوا وَقَدْ الطَّاغُوتِ إِلَى يَتَحَاكَمُوا
يَكْفُرُوا أَنْ بِإِذْنِ لِيُطَاعَ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا ....بِهِ اللَّهِ.

"যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের এ বৈষম্য তুমি লক্ষ্য করনি যে, তারা 'তাগূত'(আল্লাহদ্রোহী রাষ্ট্রশক্তি ও বিচার ব্যবস্থা)-এর কাছে নিজেদের (মোকদ্দমার) বিচার ফয়সালা চায়। অথচ তাকে অস্বীকার ও অমান্য করার নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। .... আমরা যে রাসূলকেই পঠিয়েছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই তাকে পাঠিয়েছি।" [সূরা আন্-নিসাঃ ৬০-৬৪]

ইবাদাত, দ্বীন ও শরীয়তের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এ আয়াতসমূহের মূল অর্থ ও ভাবধারা অনুধাবন করতে পাঠকদের আদৌ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ইসলামে জিহাদের এতদূর গুরুত্ব কেন, তাও পূর্বোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ধর্ম ও দ্বীনের ন্যায় শুধু সত্য বলে মেনে নিলেই এবং এই আকীদা ও বিশ্বাসের বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ শুধু পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান পালন করলেই আল্লাহর 'দ্বীন' সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ অন্য কোন দ্বীনের অধীন থেকে আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য ও অনুসরণ আদৌ সম্ভব নয়, -অন্য কোন দ্বীনের সংমিশ্রণে তার অনুসরণ অসম্ভব। অতএব আল্লাহর এই দ্বীনকে যদি বাস্তবিকই সত্য দ্বীন বলে বিশ্বাস করেন, তবে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ সাধনা ও সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকতে পারে না। এ সাধনা ও সংগ্রামের ফলেই ইসলাম কায়েম হবে, অন্যথায় এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থেকে জীবন দান করতে হবে, বস্তুত এটি একটি শাশ্বত মানদণ্ড, এতে আপনার ঈমান ও আকীদার সত্যতার যাচাই হতে পারে। ইসলামের প্রতি আপনার যথার্থ ঈমান থাকলে অপর কোন দ্বীনের অধীন থেকে সুখ নিদ্রায় অচেতন থাকা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে, তার খেদমত করা এবং তার বিনিময়ে লব্ধ জীবিকার কিছুমাত্র স্বাদ গ্রহণ করার তো কোন কথাই উঠতে পারে না। দ্বীন ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসাবে মেনে নেয়ার পর অন্য কোন দ্বীনের অধীন আপনার জীবন যদি অতিবাহিত হয়ও তবুও আপনার শয্যা কন্টকাকীর্ণ, খাদ্য বিষাক্ত ও তিক্ত বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর এ সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সাধনা না করে একবিন্দু স্বস্তিও আপনি লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন ভিন্ন অপর কোন দ্বীনের অধীন জীবন যাপন করায় আপনার যদি তৃপ্তি লাভ হয় এবং সেই অবস্থায় আপনার মন সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হয়ে থাকে, তবে আপনি আদৌ ঈমানদার নন- আপনি মনোযোগ দিয়ে যতই নামায পড়েন, দীর্ঘ সময় ধরে 'মোরাকাবা' করেন, আর কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করেন ও ইসলামের দর্শন প্রচার করেন না কেন; কিন্তু আপনার ঈমানদার না হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। দ্বীন ইসলাম বিশ্বাস করে অন্য কোন দ্বীনের প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা। কিন্তু যে সব মুনাফিক অন্যান্য দ্বীনের নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমত করে, কিংবা অন্য কোন দ্বীন (যথা গণ-দ্বীন) প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা ও চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে কিইবা বলা যায়? .....মৃত্যু দূরে নয়, যখন তা উপস্থিত হবে, তখন তাদের বৈষয়িক জীবনের 'আমলনামা' স্বয়ং আল্লাহই তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। বস্তুত এরা নিজেদেরকে যদি মুসলমান বলে মনে করে, তবে এটা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাদের সুষ্ঠু বুদ্ধি থাকলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, একটি দ্বীনকে সত্য বলে মানা ও স্বীকার করা আর বাস্তব ক্ষেত্রে অপর কোন দ্বীনের প্রতিষ্টায় সন্তুষ্ট থাকা কিংবা সেই কাজে অংশগ্রহণ করা ও সে জন্য চেষ্টা করা- পরস্পর বিরোধী কাজ। আগুন ও পানি হয়ত মিলতে পারে; কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে এরূপ কার্য পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্যই হতে পারে না।

কুরআন শরীফে এ সম্পর্কীয় সমস্ত আয়াত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্বৃত হলোঃ

لا وَهُمْ آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ فَتَنَّا وَلَقَدْ * يُفْتَنُونَ وَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ.

"তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে? এ ব্যাপারে তাদেরকে বিন্দুমাত্র পরীক্ষা করা হবে না; অথচ তাদের পূর্বে যারাই ঈমানের দাবী করেছে তাদেরকে আমরা পরীক্ষা করেছি, যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে, ঈমানের দাবী করার ব্যাপারে কে খাঁটি ও সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-'আনকাবুতঃ ২-৩]

نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي
.اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَّ مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ

"কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী করে; কিন্তু আল্লাহর পথে তারা যখনই নির্যাতিত হয়েছে, তখনই মানুষের নিযার্তনে তারা এতদূর ভীত হয়ে পড়েছে, ঠিক যতখানি ভীত হওয়া উচিত আল্লাহর আযাবের। অথচ তোমার রবের কাছ থেকে সাফল্য ও বিজয় লাভ হলে এরাই অগ্রসর হয়ে বলবেঃ 'আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম'। এদের মনের কথা কি আল্লাহ জানেন না? তবুও কোন্ সব লোক প্রকৃত মু'মিন এবং কোন্ সব লোক মুনাফিক, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখে নেবেন।" [সূরা আল-আনকাবুতঃ ১০- ১১]

.مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"মুমিনগণকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দেয়া আল্লাহর নীতি বিরোধী, (কেননা, এখন সতবাদী, মিথ্যাবাদী এবং খাঁটি ঈমানদার ও মুনাফিক একাকার হয়ে আছে) আল্লাহ পবিত্র ও পাপীদের মধ্যে নিশ্চয়ই তারতম্য করবেন।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৯]

.وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

"তোমরা কি মনে কর, তোমাদেরকে আল্লাহ এমনি ছেড়ে দেবেন? অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে, আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিন লোকদেরকে ত্যাগ করে অন্য লোকদের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেনি, তা এখনও আল্লাহ তা'আলা পার্থক্য করে দেখেননি।" [সুরা আত্-তাওবাঃ ১৬]

.أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ

"তুমি কি ওসব লোকের কথা চিন্তা করে দেখেছ, যারা অভিশপ্ত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে? মূলতঃ এরা না তোমাদের আপন লোক না তাদের। [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ১৪]

أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ الْخَاسِرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا

"...... এরা শয়তানের দলভুক্ত! সাবধান! শয়তানের দলই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় (দ্বীন ইসমলাম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করে) তারা নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা এই যে, আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণই জয়ী হব। প্রকৃত শক্তিশালী পরাক্রমশালী হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ১৯-২১]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন কোথাও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তথাকার সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী মুমিনদের পরিচয় এই হবে যে, এ বাতিল 'দ্বীন' নির্মূল করে প্রকৃত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাধনা করবে। তারা যদি বাস্তবিক তাই করে, নিজেদের সমগ্র শক্তি এ উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত করে, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী দেয় ও সকল প্রকার ক্ষতি-লোকসান অকাতরে বরদাশত করে, তবে তাদের সাচ্চা ঈমানদার হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই। তাদের চেষ্টা-সাধনা সাফল্য লাভ করলো, কি করলো না সেই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু তারা যদি বাতিল দ্বীনের প্রতিষ্ঠায়ই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত থাকে, কিংবা তাকে জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবী একেবারেই মিথ্যা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পরন্তু দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতার কথা যারা ওযর হিসেবে পেশ করে থাকে, উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাদেরও জবাব দিয়েছেন। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কোথাও চেষ্টা করা হবে, কোন না কোন বাতিল 'দ্বীন' পূর্ণ শক্তি সহকারে তথায় পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত থাকবেই। সকল প্রকার শক্তি ক্ষমতা তার দখলে থাকবে, জীবিকার ভাণ্ডার তারই কুক্ষিগত হবে এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার প্রভাব প্রবল থাকবে; এরূপ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে চূর্ণ করে অপর কোন দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি আর যাই হোক- কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ হতে পারে না। পরম শান্তি ও স্বস্তি সহকারে নবাবী চালে কাজ করলে এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারে না, আর কখনও সম্ভব নয়। বাতিল দ্বীনের অধীনে থেকে কিছু না কিছু বৈষয়িক সুখ-শান্তি লাভ হতে থাকবে, আর সেই সাথে দ্বীন ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হবে- এটা একেবারেই অসম্ভব। এ বিরাট কাজ তখনই সম্পন্ন হতে পারে যখন বাতিল দ্বীনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অধিকার, স্বার্থ ও যাবতীয় আয়েশ-আরামকে আপনারা পদাঘাত করতে প্রস্তুত হবেন এবং এ কাজে যত ক্ষতি-লোকসানেরই সম্মুখীন হতে হয়, সাহসের সাথে আপনারা তা বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকবেন। বস্তুত যারা এ কঠোর সাধনা করতে প্রস্তুত থাকবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের লোক সকল সমাজেই মুষ্টিমেয়ই থাকে। আর যারা দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করে চলতে চাইলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তাদের সম্পর্কে আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না, তারা নিরাপদে নিজেদের নফসের খেদমত করতে থাকুক, সত্যের মুজাহিদগণ দুঃখ-নির্যাতন অকাতরে ভোগ করে এ পথে অপরিসীম কুরবানী দিয়ে যখন দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে দেবে তখনই তারা এসে বলবে- 'আমরা তো তোমাদেরই দলের লোক, অতএব এখন আমাদেরও প্রাপ্য অংশ দাও'।